ভারতীয় 'জুজুর' ভয়

এ দেশে এখন খোলা বাজার এবং ট্যাক্স ট্যারিফ এমনভাবে তৈরি হচ্ছে যাতে এ বাজার ক্রমে স্ফিত হচ্ছে, চোরাচালান এতো বাড়ছে যে, দেশে প্রায় শিল্পই রুগ্ন হয়ে যাচ্ছে। সেদিকে খেয়াল না রেখেই আমরা ভারতকে ধমক দিতে চাইছি...। আসলে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের অনেকগুলো দিক আছে, সব এক প্যাকেজে এনে সমাধান করতে হবে। মন্তব্য প্রতিবেদন লিখেছেন... **গোলাম মোর্তোজা ও অনিরুদ্ধ ইসলাম**

বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কটা আবেগের। দুটি দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাধারণত এমনটা দেখা যায় না। তারপরও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটাই সত্যি। বিশেষ করে ভারতের দুটি রাজ্য ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে এক আবেগময় সম্পর্ক দীর্ঘকাল ধরে। মুক্তিযুদ্ধের সময় এই দুটি রাজ্যে এক কোটির ওপর বাংলাদেশের মানুষকে আশ্রয় নিয়েছিল। মূলত তখন থেকেই এই আবেগময় সম্পর্কের সূচনা। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই আবেগ পরিণত হচ্ছে তিক্ততায়। পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরার সঙ্গেই সেটা ঘটছে বেশি। সাম্প্রতিক সময়ে সেটা পেয়েছে ভিন্ন মাত্রা। কেন এই সময় এমনটা ঘটলো? এর পেছনের সম্ভাব্য কারণ কী হতে পারে?

বাংলায় একটা কথা আছে 'ধরা খাওয়া'। একুশে আগস্ট ঢাকায় আওয়ামী লীগ সমাবেশে গ্রেনেড হামলার পর বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন জোট সরকার বেশ বেকায়দায় ছিল। জাতীয়, আন্তর্জাতিক সব সহানুভূতিই প্রবাহিত হচ্ছিল বিরোধীদল আওয়ামী লীগের দিকে। অভিযোগের আঙুল তোলা হচ্ছিল জোট সরকারের শরিক ইসলামী মৌলবাদী দলগুলোর বিরুদ্ধে। এসব মৌলবাদী শক্তিকে আশ্রয়-প্রশ্রয়দান তাদের অপতৎপরতার সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগও উঠছিল জোটের প্রধান শরিক বিএনপির বিরুদ্ধে। বেশ কোণঠাসা অবস্থাতেই ছিল বিএনপি। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিরোধী দলনেত্রীর প্রতি আপোসের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু বিরোধী দলনেত্রী সেই হাত ধরতে রাজি হননি। অভ্যন্তরীণ রাজনীতির এই বেকায়দা অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে বিএনপি অতীতের পাকিস্তানি আমলের কায়দায় ফিরে গেছে। ঐ আমলে সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের বিক্ষোভকে দিগ্‌ভ্রান্ত করার জন্য পাকিস্তানি শাসকরা 'ভারত কার্ড' খেলতো। আর এভাবেই তারা রাজনীতির পানি ঘোলা করে সংকট উদ্ধারের চেষ্টা নিত। অতীতের পাকিস্তানি ঐ কায়দাটা এ দেশের শাসকরাও নিয়েছে। এ দেশের সামরিক শাসকরা তো বটেই, বিএনপি এমনকি আওয়ামী লীগ সরকারও অভ্যন্তরীণ রাজনীতির মূল বিষয় থেকে জনগণের দৃষ্টি সরাতে এবার এই 'ভারত কার্ড' খেলেছে। অভ্যন্তরীণ রাজনীতির প্রয়োজন মেটাতে 'ভারত কার্ড' খেলতে গিয়ে ধরা খেয়েছে বাংলাদেশ সরকার। ভারতের বিরুদ্ধে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ব্যাঘ্র হুংকার পরিণত হয়েছে বিড়ালের মিঁউ মিঁউ-তে। দু'দিন আগে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রায় 'জঙ্গ জেহাদ' ঘোষণা করে বসেছিলেন ভারতের বিরুদ্ধে। সে দেশের প্রধানমন্ত্রী, সরকার, সংবাদপত্র সবার বিরুদ্ধে চাঁছাছোলা অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন তিনি। কথা বলতে বলতে এতদূর বলে বসেছিলেন যে ভারত বাংলাদেশে তিন বিলিয়ন ডলারের যে বাণিজ্য করে একটি এসআরও জারি করে সেই বাণিজ্য বন্ধ করে দিতে পারেন তিনি। ভারতের সাত রাজ্যকে ঘিরে আছে বাংলাদেশ। সে ক্ষেত্রেও সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে বাংলাদেশ। সন্ত্রাসবাদ বাংলাদেশে ভারতের জঙ্গি ক্যাম্পের অবস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে ভারত সরকার ও ভারতের সংবাদমাধ্যমে তোলা অভিযোগগুলোকে

নাকচ করে দিয়ে বরং সে দেশে বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতার অভিযোগ তুলেছিলেন তিনি। কিন্তু এখন সেইসব অভিযোগ কার্যত মেনে নিয়ে দু'দেশের বিচ্ছিন্নতাবাদী বা সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কাছাকাছি অবস্থানে থেকে কাজ করার অঙ্গীকারের কথা ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ও ভারত। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যের উল্টো সুর গেয়ে উভয় দেশের স্বরাষ্ট্র সচিবদের বৈঠকে জঙ্গি বা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের তৎপরতার বিষয়টিকে নিরাপত্তার ইস্যু হিসেবে আখ্যায়িত করেছে দুই দেশ। ভারতীয় সংবাদপত্রে বাংলাদেশে জঙ্গিদের আশ্রয়দান সংক্রান্ত যেসব খবরাখবর সম্পর্কে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোর্শেদ খান অকূটনৈতিক ভাষায় যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন সেগুলোকে একেবারেই অগ্রাহ্য করেছে দুই দেশের স্বরাষ্ট্র সচিবদের বৈঠক। সন্ত্রাসী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়ার ব্যাপারে দু'দেশের পরস্পরের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ রয়েছে সে ব্যাপারে কেউ কাউকে উগ্রভাবে অথবা ঢালাও অভিযোগ করেনি। বরং ঐ সন্ত্রাসী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ব্যাপারে উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সমন্বিত টহলের ব্যাপারে দুই দেশ একমত হয়েছে। আরও একমত হয়েছে ভারতীয় নাগরিকদের ডাবল এন্ট্রি ভিসা দিতে, অপরাধী হস্তান্তর চুক্তি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে, মাদকদ্রব্য পাচার রোধসহ সীমান্তে বিভিন্ন প্রকার অপরাধ কমিয়ে আনতে।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোর্শেদ খানের জঙ্গি অবস্থান গ্রহণের এক সপ্তাহের মধ্যেই উভয় দেশের মধ্যে এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঐকমত্যের বিষয়টি তিনি অথবা তার অনুরাগীরা কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন জানি না। কিন্তু বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় যে তার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর চেয়ে অনেক বেশি কূটনৈতিক প্রজ্ঞা দেখিয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর ফলে নিরাপত্তার প্রশ্নে বাংলাদেশ ভারত থেকে যে চাপের মধ্যে ছিল সেই চাপ কমবে। ফলে বাণিজ্য, নদীর পানি ইস্যু, পরিবেশ, মানবপাচার, বিশেষ করে নারী ও শিশু পাচার প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বাংলাদেশ-ভারত একটি সৌহার্দ্যমূলক ও ইতিবাচক পরিবেশে আলোচনা ও সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারবে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর গর্জনের পর তেমন একটি বিষয়, অর্থাৎ নদীর পানি বন্টনের বিষয়ে বাংলাদেশ-ভারত আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। অথচ ভারতে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রধানমন্ত্রী ও পানিসম্পদ মন্ত্রী পর্যায়ে বাংলাদেশ এই মর্মে আশ্বাস পেয়েছিল যে, অতীতের বিজেপি সরকার বাংলাদেশের স্বার্থের বিপরীতে সে দেশে যে আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প হাতে নিয়েছিল সে নিয়ে তারা আর এগুবে না। বাংলাদেশ-ভারত নদী সমস্যা সমাধানের ব্যাপারেও ভারত সরকারের কাছ থেকে কিছু ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু এখন বিষয়টা উল্টে যাচ্ছে বলে মনে হয়। সম্প্রতি জানা গেছে যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে সিলেটের টিপাইমুখের কাছে ভারতে বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য বলেছে। ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প সে দেশে আবার আলোচনায় এসেছে। অবশ্য ভারতের পানি সচিব বলেছেন যে দু'দেশের মধ্যকার অভিন্ন নদীগুলোকে ঐ প্রকল্প থেকে বাদ দেয়া হবে। যাই হোক, বাংলাদেশ-ভারত নদীর পানি বন্টনের ক্ষেত্রে সেই পুরাতন সমস্যা রয়েই গেল। এর সমাধান কেবল পিছিয়ে যাচ্ছে। অথচ এই সময়ই যে এক সময় ঐ সমস্যা সমাধানে চূড়ান্ত বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

একই প্রশ্ন রয়েছে বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্যের প্রশ্নে। বাংলাদেশ শত চেষ্টা করেও ভারতের বাজারে প্রবেশ করতে পারছে না। অথচ বাংলাদেশের বাজার সয়লাব হয়ে যাচ্ছে ভারতীয় পণ্যে। বৈধভাবে পণ্য আমদানি হচ্ছে। পেঁয়াজ থেকে গাড়ি সব কিছুই আসছে বাংলাদেশে। এর মধ্যে অনেক কিছু বাংলাদেশের স্বার্থের অনুকূলে নয়। বিশেষ করে ভারতীয় গাড়ি বাংলাদেশের বাজার ছেয়ে ফেলেছে। যে গাড়িগুলোর কোনো 'রিসেল' ভ্যালু নেই। জাপানি রিকন্ডিশন গাড়ির আমদানি বন্ধ করে ভারতীয় গাড়ি আমদানির পথ খুলে দিয়েছে। এর বাইরে চোরাচালানের জন্য প্রায় পুরো সীমান্ত উন্মুক্ত। কোটি কোটি টাকার পণ্য আসছে চোরাই পথে। বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্যে ভারসাম্য আনার বিষয়টি তিমিরেই থেকে যাচ্ছে। অথচ বাংলাদেশ বাণিজ্য কূটনীতি বা অর্থনৈতিক কূটনীতির নামে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য সুবিধার বিষয়টি হাতড়ে বেড়াচ্ছে। ভারতের বিরাট বাজারে বাংলাদেশ যদি সামান্য জায়গা করে নিতে পারত তবে তার বাণিজ্য ভারসাম্যে যে নেতিবাচক অবস্থাটি আছে তার থেকে বেরিয়ে আসতে পারত। একটা সুহৃদ মিত্র দেশ হিসেবে এত বড় একটি প্রতিবেশী দেশকে পেলে বাংলাদেশের সুবিধাই হতো। সেটা পাওয়া যাচ্ছে না, গোষ্ঠী বা ব্যক্তি স্বার্থে চালিত হচ্ছে বাণিজ্যনীতি। আমদানিকারকরাই কি আসবে। কিন্তু কি রপ্তানি করা যায় এটা নিয়ে ভাবনা নেই।

বাংলাদেশের পক্ষে কী ধমক দিয়ে কোনো কাজ করানো সম্ভব? ভারত কী বাংলাদেশের ধমকে ভয় পাবে? যদি না পায় তাহলে আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতকে কেন ধমক দিলেন? এখানেই আসে যোগ্য কূটনীতির প্রশ্ন। মাথা গরম করে আর যাই হোক কূটনীতি হয় না। ভারতের মতো সুপার পাওয়ারের কাছ থেকে নিজের সুবিধা আদায় করতে হয় কৌশলে, যুক্তি দিয়ে...

বাণিজ্যনীতির সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক থাকছে না। যার জন্যে বাংলাদেশ-ভারত এই সম্পর্কটিই এত বছরে দাঁড়াল না। এর জন্য বড় দেশ হিসেবে ভারতের মূল দায়িত্ব তো রয়েছেই, প্রতিবেশী ছোট দেশ হিসেবে বাংলাদেশের দায়িত্বও কম নয়। বরং বাংলাদেশকে এ ব্যাপারে অনেক বেশি বাস্তববাদী হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের এই বাস্তবতাটাই বিভিন্ন সময় অস্বীকার করা হয়েছে উভয় দিক থেকে। বরং উভয় দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এমন সব বিষয়কে সামনে দাঁড় করানো হয়েছে যা অতিক্রম করাই দুরূহ হয়ে উঠছে। অথচ উপমহাদেশের চির বৈরী ভারত-পাকিস্তান তিনটা যুদ্ধ, পরমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা এবং সর্বোপরি কাশ্মীর ইস্যুর পরও দু'দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিরোধ মিটিয়ে ফেলছে।

ভারত-পাকিস্তানের গণযোগাযোগের ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি রয়েছে বাংলাদেশ-ভারতের তা নেই। বাংলাদেশের দু'দিকে ভারতের দুটি অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার সঙ্গে বাংলাদেশের অচ্ছেদ্য সংস্কৃতির সম্পর্ক রয়েছে। এই দুটি অঙ্গরাজ্যেই রয়েছে বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল দুটি সরকার। এদের কারণেই

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এ দেশ থেকে বাংলাদেশীদের বহিষ্কারের নামে 'পুশইন' পরিকল্পনা কার্যকর করতে পারেনি। বাংলাদেশ-ভারত অভিন্ন নদীর পানির সমস্যার ব্যাপারেও এই দুটি রাজ্যের সক্রিয় সহযোগিতা পেয়েছে বাংলাদেশ। কিন্তু ভারতের এই দুটি অঙ্গরাজ্যের সঙ্গে যেন পায়ে পায়ে লাগিয়ে ঝগড়া করতে চাচ্ছে বাংলাদেশ। অথচ এতে বাংলাদেশের কোনো স্বার্থ উদ্ধার হচ্ছে না। বরং স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক না দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে অবশ্য প্রধান দায় ভারতের। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্যদানের সুবাদে ভারত সব সময়ই আশা করেছে যে বাংলাদেশ তার প্রভাববলয়ে থাকবে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, এমনকি বাংলাদেশের প্রশাসনও চলবে তাদের ইচ্ছাধীন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বাংলাদেশে শেখ মুজিবের মতো নেতার অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের আমলাতন্ত্র ও ব্যবসায়ীদের ইচ্ছানুযায়ী একটি ভ্যাসেল (Vassell) রাষ্ট্রে পরিণত হয়নি। বাংলাদেশ তার স্বাধীন সত্তা নিয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ভারতীয় রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক আমলাতন্ত্র ও বড় পুঁজি বাংলাদেশ সম্পর্কে তাদের আকাঙ্ক্ষা কখনো গোপন রাখেনি। বাংলাদেশ সংক্রান্ত যেকোনো প্রশ্নে বাংলাদেশকে ভারতীয় আমলাতন্ত্রের বৈরিতার মুখে পড়তে হয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক সিদ্ধান্তের পরও আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক আটকে গেছে। ইতিমধ্যে গত ত্রিশ বছরে বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে। পাকিস্তান আমলের সবচেয়ে প্রতিক্রিয়ার শক্তিই এ দেশে ক্ষমতাসীন হয়েছে। এখন দেশ শাসনে অংশীদার হিসেবে থাকলেও এখন মূল নিয়ন্ত্রক হিসেবে উঠে আসছে। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক পরিচালিত হয়েছে বাংলাদেশের জাতি ও জনগণের স্বার্থের দিক থেকে নয়। এসব শাসকদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির প্রয়োজনের বিবেচনায়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আন্তর্জাতিক স্বার্থ। বাংলাদেশ যখন পাকিস্তানের আইএসআই'র কর্মকান্ডের অন্যতম কেন্দ্র হয় তখন ভারত তার নিরাপত্তার প্রশ্নে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারে না এটা ভারতের অভিযোগ। তেমনি বাংলাদেশও উদ্বিগ্ন হয়, এ দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি প্রভাবিত করার ব্যাপারে ভারতীয় 'র'-এর তৎপরতায়। এ ধরনের একটি অবিশ্বাস ও সন্দেহের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে উভয় দেশের মধ্যে। বাংলাদেশ ও ভারতের উভয় দেশের মৌলবাদী শক্তির উত্থান ও ক্ষমতারোহণ এই সম্পর্ককে আরো জটিল করে তুলেছে।

বড় দেশ হিসেবে বাংলাদেশের সঙ্গে যেমন আচরণ করা প্রয়োজন ছিল, ভারত তেমনটা করে না, করেনি। এটা প্রায় পুরোপুরি সত্যি। কিন্তু ভারত না হয় বড় দেশ, শক্তিশালী দেশ, যা করা উচিত নয়, তাই করছে। বাংলাদেশ কী করছে? বাংলাদেশের পক্ষে কী ধমক দিয়ে কোনো কাজ করানো সম্ভব? ভারত কী বাংলাদেশের ধমকে ভয় পাবে? যদি না পায় তাহলে আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতকে কেন ধমক দিলেন? এখানেই আসে যোগ্য কূটনীতির প্রশ্ন। মাথা গরম করে আর যাই হোক কূটনীতি হয় না। ভারতের মতো সুপার পাওয়ারের কাছ থেকে নিজের সুবিধা আদায় করতে হয় কৌশলে, যুক্তি দিয়ে। নিজ অবস্থান শক্ত রাখা যায়, কাজও হয়। ধমক দিয়ে নয়। দেশ হিসেবে ভারত যত বড়ই হোক না কেন, কিছু বিষয়ে বাংলাদেশের ওপরে তাকে নির্ভর করতে হয়। বাংলাদেশ আলোচনা করতে পারে সেই বিষয়গুলো নিয়ে।

বাংলাদেশ শত চেষ্টা করেও ভারতের বাজারে প্রবেশ করতে পারছে না। অথচ বাংলাদেশের বাজার সয়লাব হয়ে যাচ্ছে ভারতীয় পণ্যে। বৈধভাবে পণ্য আমদানি হচ্ছে। পেঁয়াজ থেকে গাড়ি সব কিছুই আসছে বাংলাদেশে। এর মধ্যে অনেক কিছু বাংলাদেশের স্বার্থের অনুকূলে নয়

বাংলাদেশ মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণায় গো ধরে বসে আছে ট্রানজিট দেব না। কেন দেব না? ট্রানজিট দিলে যদি বাংলাদেশের জন্যে লাভ হয়, তাহলে দিতে সমস্যা কোথায়? ট্রানজিট দিলে বাংলাদেশ কী কী ভাবে লাভবান হতে পারে সেটা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। আলোচনার শর্ত হতে পারে এটা যে বাংলাদেশ ট্রানজিট দেবে, ভারত সীমান্ত সমস্যার সমাধান করবে। নেপালকে ট্রানজিট দিতে হবে বাংলাদেশে প্রবেশের। দখল করে রাখা বাংলাদেশের ভূ-খন্ড ভারত ফেরত দেবে। সীমান্তে অকারণে বিএসএফ নিরীহ বাংলাদেশী গুলি করে হত্যা করবে না। চট্টগ্রাম বন্দর ত্রিপুরাকে ব্যবহার করতে দিলে শুধু ভারত বা ত্রিপুরা লাভবান হবে না। লাভবান হবে বাংলাদেশও। ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার জন্য এ বিষয়গুলোকে শর্ত হিসেবে ব্যবহার করতে পারে বাংলাদেশ।

এসব চিন্তাভাবনার ধারে কাছে দিয়েও যাচ্ছে না বাংলাদেশ। একবার দেব না বললেও, এখন বাধ্য হয়ে ডাবল এন্ট্রি ভিসা দিতে হচ্ছে। অথচ আগরতলার সঙ্গে যখন বাস চলাচল শুরু হলো তখন যদি বাংলাদেশ ডাবল এন্ট্রি ভিসা দেয়ার ব্যাপারে রাজি হতো তাহলে এর থেকে সুবিধা নেয়া যেত। এর বিনিময়ে বাংলাদেশ ত্রিপুরা তথা সেভেন সিস্টারসে পণ্য যাওয়ার সুযোগ দাবি করতে পারতো। এটা হতো কূটনৈতিক সাফল্য। কিন্তু বাংলাদেশ এ পথে যায়নি। বাংলাদেশ সাহসী হতে চায় না, গুটিয়ে যায়।

এই ক্ষেত্রে ভারতের মিডিয়ার ভূমিকাটি এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ভারতের মিডিয়া, বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার মিডিয়া বাংলাদেশের প্রতি চরম বৈরীভাবাপন্ন। গত একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলা নিয়ে ভারতের এই মিডিয়া যেসব সংবাদ ছাপিয়েছে, মন্তব্য প্রকাশ করেছে তা যেকোনো শুভজ্ঞানসম্পন্ন লোকের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। সেখানেও এ ধরনের অজুহাত তুলে ঝগড়া বাধানোর লোকেরও অভাব নেই। পশ্চিমবাংলার আনন্দবাজার, স্টেটসম্যান (বাংলা) ঢাকার গ্রেনেড হামলা নিয়ে যে সংবাদ পরিবেশন করেছে তা কল্পনাকেও হার মানায়। অন্যদিকে 'দি হিন্দু', 'পাইওনিয়ার', 'আউট লুক' পত্রিকাগুলোও এবার বাংলাদেশ বিরোধিতায় কোমর বেঁধে নেমেছিল।

অবশ্য পশ্চিমবাংলার বাংলা পত্রিকাগুলো সে দেশের রাজনীতি সম্পর্কেও সমান মিথ্যাচার করতে অথবা বিকৃত সংবাদ পরিবেশন করতে সমান পারঙ্গম। পশ্চিমবাংলায় গত ২৫ বছর ধরে বামফ্রন্ট সরকার থাকলেও এসব প্রিন্ট মিডিয়া অথবা ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে তারা কখনো জায়গা পায় না। পেলেও বিকৃতভাবে পায়। সে হিসেবে পশ্চিমবাংলার এই বাংলা মিডিয়ার বক্তব্য ধরতে গেলে ঝগড়াই বাধবে। তাই এই মিডিয়া যদি বাংলাদেশ-ভারতের

কূটনৈতিক তৎপরতার ভিত্তি হয়, তা হলে বিপদের কথা।

কিন্তু বাংলাদেশ তার সাম্প্রতিক কূটনৈতিক তৎপরতায় ভারতের এই মিডিয়া প্রচারকেই উভয় দেশের সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে ধরেছে। ভারত-বাংলাদেশ তরুণ সাংবাদিকদের সংলাপে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর যে বক্তব্য উভয় দেশের সম্পর্কের মধ্যে ঝড় তুলেছিল তা এই মিডিয়ার বক্তব্যকে কেন্দ্র করে প্রধানত। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ সম্পর্কে পরবর্তীতে তার ব্যাখ্যায় বলেছে, ভারতের মিডিয়াকে সচেতন রাখার জন্যেই পররাষ্ট্রমন্ত্রী তার ঐ বক্তব্য বলেছিলেন। কিন্তু সেটা তাদের সচেতন করার পরিবর্তে উভয় দেশের সম্পর্ককেই অচেতন করে দেবার উপক্রম করেছিল। বাংলাদেশ-ভারত স্বরাষ্ট্র সচিবের বৈঠক এই অবস্থা থেকে বের হয়ে আসার একটা পথ করে দিয়েছে। সামনের দিনগুলোতে আবার কোনো অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রয়োজনে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে কিনা সেটা জানা নেই। এ ব্যাপারে কেবল 'সতর্ক' থাকা নয়, দু'দেশের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের প্রশ্ন আছে।

ভারতের ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় বাম প্রভাবিত কংগ্রেস সরকারের প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তার অসংযত বক্তব্যে ভারত সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন সে ব্যাপারে ভারত সরকারের তীব্র প্রতিক্রিয়া হলেও তারা একে নিম্ন পর্যায়ে রাখার সিদ্ধান্ত নেয় এবং দুই দেশের পানি সচিব ও স্বরাষ্ট্র সচিবদের মধ্যে বৈঠক দুটি বহাল রাখে। নদীর পানির ক্ষেত্রে উভয় দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অবনতির নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া পড়ে। তবে ভারতের পানিসম্পদ মন্ত্রী পরবর্তীতে জানিয়েছেন যে, অভিন্ন নদীর পানি বন্টন নিয়ে ঢাকার উদ্বেগের সুরাহা করতে ভারত প্রস্তুত। স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যায়েও ভারত তার জন্য জরুরি নিরাপত্তার প্রশ্নের একটি আপাত সমাধান পেয়ে খুশি হয়েছে। ঐ বৈঠকে জঙ্গিদের আশ্রয় দেয়া নিয়ে ভারতীয় অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করেনি তারা।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও সংযম দেখানো হয়েছে বলে জানা যায়। বিএনপি নেতৃত্বের একটি অংশ ও শরিক ইসলামী দলগুলো পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোরশেদ খানের বক্তব্যের জন্য বাহবা দিলেও বাংলাদেশ শেষ পর্যন্ত সম্বিত ফিরে পেয়েছে বলেই মনে হয়। দুষ্ট লোকের অবশ্য মন্তব্য যে, স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে ভারতকে কনসেশন দেয়া হবে বলেই পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ ধরনের বাঘের গর্জন করে জনমনে একটা ঘোর তৈরি করতে চেয়েছিলেন। অনেকটা পাতানো খেলা। সেটাও যদি কৌশল হয় তা হলেও সঠিক নয়। ২০০০-এর গত সংখ্যাতেই বলা হয়েছে একটা কাঁচা কূটনীতির কাজ করেছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

বাণিজ্যনীতির সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক থাকছে না। যার জন্যে বাংলাদেশ-ভারত এই সম্পর্কটিই এত বছরে দাঁড়াল না। এর জন্য বড় দেশ হিসেবে ভারতের মূল দায়িত্ব তো রয়েছেই, প্রতিবেশী ছোট দেশ হিসেবে বাংলাদেশের দায়িত্বও কম নয়। বরং বাংলাদেশকে এ ব্যাপারে অনেক বেশি বাস্তববাদী হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের এই বাস্তবতাটাই বিভিন্ন সময় অস্বীকার করা হয়েছে উভয় দিক থেকে

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ককে রাজনৈতিক আবেগ, অভ্যন্তরীণ রাজনীতির প্রয়োজন থেকে বের করে এনে একেবারেই বাস্তবতার ওপর দাঁড় করাতে হবে। ভারত বাংলাদেশের বৃহৎ প্রতিবেশী রাষ্ট্রই নয়, অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী। বলা যেতে পারে, বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রে এশিয়া অঞ্চলের প্রধান প্লেয়ারদের একজন। বাংলাদেশকে এ ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে। আবার বাংলাদেশের ওপর কেউ খবরদারি করবে এটাও গ্রহণযোগ্য নয় কোনোমতে। এটা স্বদেশের সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেয়া। রাজনীতির কূটনীতির ইতিহাসের বস্তাপচা কথা দিয়ে ঠেকানো যাবে না।

বাংলাদেশকে তার স্বাধীন ভূমিকার জন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাজ্ঞ ভূমিকা পালন করতে হবে। বাংলাদেশ কতখানি নিজের স্বাধীন অস্তিত্ব ও সম্মান নিয়ে প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক করতে পারবে তা নির্ভর করছে বাংলাদেশের সামর্থ্যের ওপর। অন্যের শেখানো বুলি উচ্চারণ করে বাংলাদেশের নিজের স্বার্থকে, বাংলাদেশের অর্থনীতির স্বার্থ, জনগণের স্বার্থকে উর্ধ্বে তুলে ধরেই বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কটিকে দাঁড় করাতে হবে। নিজের ইচ্ছেমত ভারত কার্ড এখন অচল। জুজুর ভয়ও পায় না সাধারণ মানুষ। কারণ এ সরকারই বাংলাদেশকে ক্রমেই করে তুলছে ভারত নির্ভর।